প্রতিরোধ: দাদ সহজেই অন্যের শরীরে সংক্রমিত হয়। ত্বক ভালো না হওয়া পর্যন্ত রোগী একা আলাদা বিছানায় ঘুমাবে এবং অন্যদের থেকে দূরে থাকবে। পরিচ্ছন্নতার সাধারণ নিয়মাবলি মেনে চলতে হবে।

ফোঁড়া:
ফোঁড়া শুরু হয় ত্বকের নিচে পিণ্ড থেকে। পিণ্ড যদি শক্ত ও যন্ত্রণাদায়ক হয় এবং উপরের ত্বক যদি লাল ও গরম হয় তা হলে বুঝতে হবে ত্বকের নিচে সংক্রমণ হয়েছে। এ ধরনের পিণ্ডকে ফোঁড়া বলে।

পরিচর্যা ও চিকিৎসা: ফোঁড়ার উপরের ত্বক যদি লাল ও গরম থাকে তাহলে রোগীকে গরম সেঁক দিতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

চর্মরোগ ছাড়াও আর কিভাবে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে?
চর্মরোগ ছাড়াও আঘাত, পুড়ে যাওয়া, রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা অথবা প্রয়োজনীয় পরিচর্যার অভাবে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে।

ধাপ - ৩: কান পাকা ও পরিচর্যা

ছাত্রছাত্রীদের কাছে কান পাকা রোগ কেন হয় তা জানতে চাইবেন এবং নিচের তথ্যের সাথে মিলিয়ে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

কান পাকা রোগ কেন হয়?
কান পাকা ও কানে ময়লা জমে কানে ব্যথা একটি সাধারণ রোগ।
কানে খোঁচাখুঁচি করলে, পোকা-মাকড় কানে ঢুকলে বা অপরিষ্কার পানিতে সাঁতার কাটলে, কানের সংক্রমণ হতে পারে।
তাছাড়া ঠান্ডা লাগা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টনসিলে প্রদাহ, সাইনোসাইটিস ইত্যাদি রোগ হলেও কান ব্যথা হতে পারে, এমনকি কান পাকা রোগও হতে পারে।

কান পাকা রোগ কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়?

- কানে যাতে কোনো পোকামাকড় ঢুকতে না পারে সেজন্য সাবধান থাকতে হবে
- কানে যাতে পানি ঢুকতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে
- হঠাৎ করে পানি ঢুকে গেলে সাথে সাথে কাৎ করে ঝাঁকিয়ে পানি ফেলে দিতে হবে
- অপরিষ্কার পানিতে গোসল বা সাঁতার কাটা থেকে বিরত থাকতে হবে
- সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টনসিলে প্রদাহ, সাইনোসাইটিস ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা সঠিক সময় করাতে হবে
- কানে কোন সমস্যা হলে দেরি না করে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে
- কানে আঘাত লাগলে কানের পর্দা ফাটতে পারে। তাই কানে চপেটাঘাত করা যাবে না।

ধাপ - ৪: দাঁতের ব্যথা ও পরিচর্যা

ছাত্র/ছাত্রীদের কাছে দাঁত ব্যথার কারণ, লক্ষণ ও এর প্রতিরোধ সম্পর্কে জানতে চাইবেন এবং নিচের তথ্যের সাথে মিলিয়ে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

দাঁতের প্রয়োজন

দাঁত শরীরের খুবই স্পর্শকাতর অঙ্গ। ভালোভাবে খাওয়া ও কথা বলার জন্য প্রয়োজন সবল দাঁত ও মাড়ি। খাদ্যদ্রব্য ভালোভাবে হজম করার জন্য ভালোভাবে চিবিয়ে খেতে হয়। শক্ত ও সবল দাঁত না থাকলে ভালোভাবে খাবার চিবানো সম্ভব নয়। খাদ্যদ্রব্য না চিবিয়ে খেলে ভালোভাবে হজম হয় না। ফলে নানারকম পেটের অসুখ দেখা দেয়।

সুন্দর চেহারা এবং ভালো স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য দাঁত ও মাড়ির যত্ন নিতে হবে।

দাঁতের ক্ষয় কি?

প্রতিবার খাওয়ার পর যদি ভালোভাবে দাঁত পরিষ্কার করা না হয় তাতে কিছু কিছু খাদ্য কণা দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকে। এই খাদ্য কণা থেকে এক ধরনের এসিড তৈরি হয়, যা দাঁতের এনামেল ছিদ্র করে ভেতরে গর্তের সৃষ্টি করে, যা আস্তে আস্তে নার্ভ স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ও ব্যথার সৃষ্টি হয়। এই গর্তকে দাঁতের ক্ষয় বা ক্যারিজ বলে।

অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, দাঁতের পোকা থাকে এবং সেই পোকাই কামড়ায় এবং দাঁতে ব্যথা হয়। আসলে দাঁতের পোকা বলতে কিছু নেই, এটা দাঁতের ক্ষয়।

কিভাবে দাঁতের ক্ষয় (ক্যারিজ) বোঝা যায়?

দাঁতের অনেক ক্ষয় আছে যা দেখা যায় না, বোঝা যায় না, ভেতর দিকে হয়। গরম ঠান্ডা বা মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়ার পর ব্যথা অনুভূত হয়। আস্তে আস্তে ব্যথা বাড়ে ও সবসময় থাকে। যদি চিকিৎসা না করা হয় তবে বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং গোড়ায় ফোঁড়ার সৃষ্টি হয়।

মাড়ির সংক্রমণ কি?

এটাও দাঁতের ফাঁকে আটকা থাকা খাদ্যদ্রব্য পরিষ্কার না করার জন্য হয়। প্রথমে মাড়িতে রক্তপাত হয় এবং মাড়িতে ঘা হয়। ঘা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এবং দাঁতের গোড়ায় বিস্তার লাভ করলে দাঁত নড়ে ও ব্যথা হয়।

কিভাবে দাঁত ব্যথা ও মাড়ির ব্যথা প্রতিরোধ করা যায়?

- নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করতে হবে। দাঁত ব্রাশ করার পর মুখ কুল-কুচি করার সময় মাড়ি সঞ্চালন করতে হবে
- মাঝে মাঝে পেস্ট পরিবর্তন করা উচিত এবং ফ্লুরাইড পেস্ট ব্যবহার করা উচিত
- প্রতিবার খাওয়ার পর ভালোভাবে কুলি করতে হবে। মিষ্টি জাতীয় খাবার খেলে মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে
- আলপিন, সেফটিপিন জাতীয় ধারালো কিছু দিয়ে দাঁত খোঁচাখুচি করা যাবে না। যদি কোনো মাংস বা শক্ত খাবার দাঁতে আটকে থাকে তাহলে টুথপিক/খিলাল ব্যবহার করতে হবে
- দাঁতের জন্য উপকারী খাদ্য ও পানীয় যথা: দুধ, টাটকা ফলমূল ও শাক-সবজি, নারকেল, মিষ্টি আলু ইত্যাদি নিয়মিত খাওয়া উচিত।

দাঁত কীভাবে ব্রাশ করবে

- নিয়মিত ২ বার যথা: সকালে নাস্তার পর ও রাতে ঘুমানোর আগে দাঁত ব্রাশ করা উচিত
- দাঁত পাশাপাশি ব্রাশ না করে উপর থেকে নিচের দিকে দাঁত মাজতে হবে, যাতে দাঁতের ফাঁকে কিছু লেগে না থাকে।

ধাপ - ৫: চোখের রোগ ও পরিচর্যা

ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করুন চোখের রোগ এবং তার পরিচর্যা সম্পর্কে তারা কী জানে। আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

চোখ খুব সংবেদনশীল অঙ্গ। আঘাত, রোগ-জীবাণু, রাসায়নিক পদার্থ, ধুলাবালি দ্বারা চোখ আক্রান্ত হতে পারে এবং রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

কি কারণে চোখের রোগ বা সমস্যা হতে পারে?

- নোংরা হাত, কাপড় দিয়ে রগড়ালে জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ হতে পারে
- কাঠের গুঁড়া, বালি বা ময়লা থেকে চোখে সংক্রমণ বা ইনজুরি হতে পারে
- নোংরা পানিতে গোসল করলে চোখে সংক্রমণ হতে পারে
- পর্যাপ্ত ভিটামিন 'এ' না খেলে অপুষ্টিজনিত কারণে রাতকানা রোগ হতে পারে
- শিশুরা খেলতে গেলে অসাবধানতাবশতঃ চোখে আঘাত লাগতে পারে।

চোখ ওঠা কি?

চোখ ওঠা বা কনজাংটিভাইটিস একটি সংক্রামক ব্যাধি। চোখ উঠলে চোখ লাল হয়, পানি পড়ে, পুঁজ বা পিচুটি দ্বারা আটকে যায়।

চোখ উঠলে যা করতে হবে:

- চোখ ওঠা রোগী অন্য কারো সঙ্গে খেলাধুলা করবে না বা ঘুমাবে না
- রোগীর ব্যবহৃত গামছা/তোয়ালে অন্য কেউ ব্যবহার করবে না
- আক্রান্ত চোখে হাত লাগালে হাত সাবান দিয়ে ধুতে হবে
- সম্ভব হলে রোগীকে কালো চশমা ব্যবহার করতে হবে
- চিকিৎসকের পরামর্শ মত চোখে মলম/ড্রপ লাগাতে হবে।

এছাড়া সুস্থ অবস্থায় ধুলাবালি থেকে চোখকে রক্ষা করা, নিয়মিত চোখ ধোয়া, নিরাপদ পানিতে গোসল করলে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

চোখের রোগ প্রতিরোধে করণীয়:

- সাবান ও পরিষ্কার পানি দিয়ে হাত এবং চোখ-মুখ পরিষ্কার করা
- আঙ্গুল, গামছা বা শরীর ধোয়া-মোছার কোন কাপড় দিয়ে চোখ না রগড়ানো
- ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ও সুষম খাবার খাওয়া
- ৬ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত (৬ মাস অন্তর) শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো
- চোখে যেকোন সমস্যা দেখা দিলে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা হাসপাতালে যাওয়া।

ধাপ - ৬: সারসংক্ষেপ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে উপরোক্ত রোগব্যাধিগুলোতে আক্রান্ত হওয়া খুবই সাধারণ ঘটনা। কিন্তু সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা না করলে তা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণ রোগব্যাধিগুলো কি এর কারণ এবং বিশেষভাবে প্রতিরোধ সম্পর্কে জানতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণ রোগব্যাধি সম্পর্কে জানবে এবং প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে অন্যদেরও সচেতন করবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন:

১) জ্বর কি? জ্বর হলে কি করা উচিত?
২) চর্মরোগ কি? কেন চর্মরোগ হয়? সাধারণ কয়েকটি চর্মরোগের নাম বল?
৩) খুজলি, খোস-পাঁচড়া, ফোঁড়া ও দাদ কেন হয় এবং কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়?
৪) কান পাকা রোগ কেন হয়? কিভাবে কান পাকা রোগ প্রতিরোধ করা যায়?
৫) দাঁতের ক্ষয় কি? কিভাবে বুঝব আমার দাঁতের ক্ষয় (ক্যারিজ) হয়েছে? কিভাবে দাঁত ব্রাশ করা উচিত?
৬) মাড়ির সংক্রমণ কি? কিভাবে দাঁত ব্যথা ও মাড়ির ব্যথা প্রতিরোধ করা যায়?
৭) কি কারণে চোখের রোগ বা সমস্যা হতে পারে? চোখ ওঠা কি? কিভাবে চোখের রোগ প্রতিরোধ করা যাবে?

অধ্যায় - ২০: পানি ও খাদ্যবাহিত রোগ

সময়: ৪৫ মিনিট

উদ্দেশ্য: ছাত্র-ছাত্রীরা পানিবাহিত রোগের বিষয়ে সচেতনতা অর্জন করবে এবং রোগের প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	পানি ও খাদ্যবাহিত রোগ	৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ফ্লিপচার্ট মাল্টিমিডিয়া
২.	ডায়রিয়া	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ফ্লিপচার্ট মাল্টিমিডিয়া
৩.	আমাশয়	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ফ্লিপচার্ট মাল্টিমিডিয়া
৪.	জন্ডিস	৫ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ফ্লিপচার্ট মাল্টিমিডিয়া
৫.	টাইফয়েড	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ফ্লিপচার্ট মাল্টিমিডিয়া
৬.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর	

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষকের জন্য সহায়ক তথ্য:

ধাপ - ১: পানি ও খাদ্যবাহিত রোগ

আমাদের দেশে জনমানুষের অসুস্থ হয়ে পড়ার একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে পানি ও খাদ্যবাহিত রোগ। অথচ এসব রোগ থেকে রক্ষা পাবার উপায় সর্ম্পকে জানা থাকলে খুব সহজেই রোগাক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে মুক্ত থাকা যায়। এসব রোগ উচ্চ সংক্রমণযুক্ত, ফলে একজনের হলে তা অন্যজনকে এবং দ্রুত আশে-পাশের লোকজনের ও পাড়া-প্রতিবেশীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, পানি ও খাদ্যবাহিত রোগ বলতে তারা কি বোঝে? উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন এবং আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

পানি ও খাদ্যবাহিত রোগ

যে পানিতে নানা প্রকার রোগ-জীবাণু, ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি থাকে এবং যা পান করলে রোগ হয় তাকে দূষিত পানি বলে।

দূষিত পানি অথবা দূষিত খাবারের মাধ্যমে যেসব রোগ একজনের শরীরে সংক্রমিত হয় তাকে পানি/খাদ্যবাহিত রোগ বলে। যেমন- ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড, জন্ডিস, কৃমি, পলিওমাইলাইটিস ইত্যাদি।

নিরাপদ পানি ও খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে এসব রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

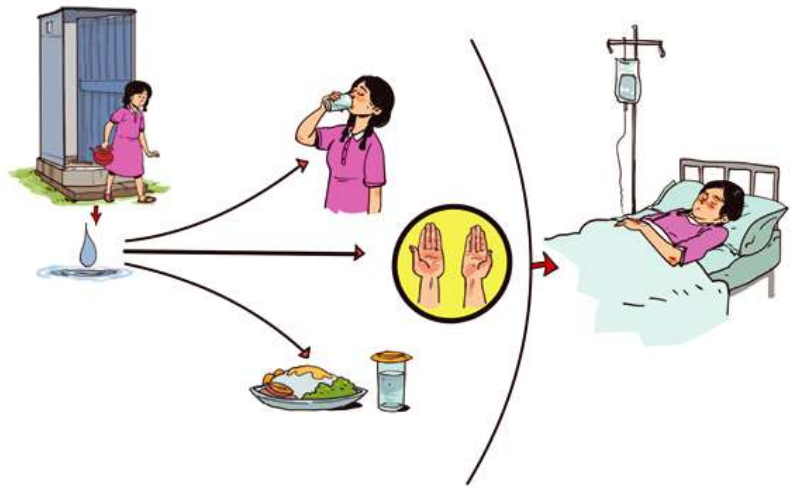

ধাপ - ২: ডায়েরিয়া

ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞেস করুন, তারা ডায়রিয়া সম্পর্কে কি জানেন। ডায়রিয়া রোগের কি কি লক্ষণ আছে। উত্তর জেনে নিয়ে স্লাইড প্রদর্শন করে আলোচনা করুন। কোন প্রশ্ন আছে কিনা জেনে নিয়ে উত্তর দিন।

ডায়রিয়া কি

স্বাভাবিকের চেয়ে ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হওয়াকে ডায়রিয়া বলে। ডায়রিয়া হলো প্রতিদিন কমপক্ষে তিনবার পাতলা পায়খানা বা তরল মলত্যাগ হওয়ার রোগ। এটা প্রায়শঃ কয়েকদিন স্থায়ী হয় এবং এর ফলে শরীরে পানিস্বল্পতা দেখা দিতে পারে।

ডায়রিয়ার ফলে শরীর থেকে পানি ও লবণ জাতীয় পদার্থ বেরিয়ে গিয়ে পানিস্বল্পতার সৃষ্টি হয়।

ডায়রিয়া কিভাবে হয়

ডায়রিয়া একটি সংক্রামক রোগ, যা রোগ-জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়। এসব জীবাণু যেভাবে শরীরে ঢোকে

- দূষিত খাবার পানি- উদাহরণস্বরূপ, পুকুর বা নদীর পানি, অরক্ষিত কূয়ার পানি অথবা ময়লা পাত্রে রক্ষিত পানি পান করলে
- দূষিত খাবার- যথা: ভালভাবে না ধোয়া খাবার, বাইরে অনেকক্ষণ রেখে দেওয়া রান্না করা খাবার, ময়লা, মাছি ও পশু থেকে অরক্ষিত খাবার খেলে
- নিরাপদ নয় এমন খাবার খেলে- রান্নার আগে দীর্ঘ সময় ফেলে রাখা কাঁচা খাবার যেমন- মাছ, মাংস
- অপরিষ্কার হাতে যেমন, হাত না ধুয়ে রান্না করলে বা খেলে।

ডায়রিয়া রোগীর পানি পানিস্বল্পতা

ডায়রিয়া হলে শরীর থেকে পানি ও লবণ বেরিয়ে যায়। শরীরের জন্য ঐ লবণ ও পানি খুব প্রয়োজন, এর ঘাটতির ফলে শরীর তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে। পানি ও লবণ তাড়াতাড়ি পূরণ করা প্রয়োজন। যাদের শরীর থেকে বেশি লবণ ও পানি বেরিয়ে গেছে তাদের পানি ঘাটতি দেখা দেয়।

মারাত্মক পানি স্বল্পতার (Severe dehydration) **লক্ষণগুলো হচ্ছেঃ**
(নীচের যে কোন দুইটি লক্ষণ অবশ্যই থাকতে হবে)

- রোগী পান করতে পারবে না
- চোখ বসে যায়
- রোগী নেতিয়ে পড়ে বা
- পেটের চামড়া টেনে ছেড়ে দিলে তা খুব ধীরে ধীরে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়।

স্বল্প পানি স্বল্পতার (Some dehydration) **লক্ষণ গুলো হচ্ছেঃ**
(নীচের যে কোন দুইটি লক্ষণ অবশ্যই থাকতে হবে)

- রোগী খুব তৃষ্ণার্ত বোধ করে
- চোখ বসে যায়
- রোগী অস্থির বা খিট খিটে মেজাজের হবে
- পেটের চামড়া টেনে ছেড়ে দিলে তা খুব ধীরে ধীরে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়।

ডায়রিয়া হলে করণীয়

- স্বাভাবিক খাবারের পাশাপাশি অতিরিক্ত পরিমাণ তরল খাবার, যেমন- খাবার স্যালাইন, ভাতের মাড়, চিড়ার পানি, ডাবের পানি, ডালের পানি ইত্যাদি খাওয়ানো
- প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে
- যদি পায়খানার সাথে রক্ত থাকে তবে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিতে হবে
- মারাত্মক পানি স্বল্পতার লক্ষণ থাকলে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।

খাবার স্যালাইন তৈরির পদ্ধতি

হাত ধুয়ে নিন, একটি পরিষ্কার পাত্রে আধা লিটার পরিষ্কার পানি নিন।

পানি ফুটিয়ে ঠান্ডা করে নেয়া উচিত। যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সবচাইতে পরিষ্কার যে পানি পাওয়া যাবে- যেমন টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করুন।

প্যাকেটের পাউডার পাত্রের পানিতে ঢেলে দিন। যতক্ষণ না পাউডার পানিতে গলে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ভালভাবে নাড়তে থাকুন।

ডায়রিয়া প্রতিরোধের উপায়

- নিরাপদ পানি পান করতে হবে
- সর্বদা সঠিকভাবে খাদ্য রান্না করতে হবে এবং রান্নার পর পর খেয়ে নিতে হবে
- খাওয়ার আগে এবং পায়খানার পর হাত ভালভাবে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে
- স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহার করতে হবে, শিশুর পায়খানা যেখানে সেখানে ফেলা যাবে না
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জিনিসপত্র ব্যবহার করতে হবে, খাবার ঢেকে রাখতে হবে।

একটি পরিষ্কার পাত্রে আধা লিটার পরিমান বিশুদ্ধ পানি ঢালুন।

এবার একটি ওরস্যালাইনের সবটুকু মিশ্রন ঐ পাত্রে ঢালুন।

একটি পরিষ্কার চামচের সাহয্যে মিশ্রণ ও পানি ভালোভাবে মিশিয়ে খাওয়ার স্যালাইন তৈরি করুন।

নিচের লেখা নিয়ম অনুযায়ী রোগীকে খাওয়ার স্যালাইন খাওয়ান।

ধাপ - ৩: আমাশয়

একটি অতিসাধারণ ব্যাধি যা মানব অন্ত্রে সংক্রমণের মাধ্যমে ঘটে থাকে। সাধারণত এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা (Entamoeba histolytica) নামক পরজীব কিংবা সিগেলা (Shigella) নামক জীবাণু মানবদেহের পরিপাকতন্ত্রে সংক্রমণ করে যা আমাশয়ের কারণ।

সংক্রমণের ফলে অন্ত্রের সংশ্লিষ্ট অংশে প্রদাহের সৃষ্টি হয়, পেট ব্যথা করে এবং পিচ্ছিল আম অথবা শ্লেষ্মা ও রক্তসহ পাতলা পায়খানা হতে থাকে।

আমাশয় দু ধরনের হয়ে থাকে: (১) আমযুক্ত বা এমিবিক আমাশয় এবং (২) রক্ত আমাশয় বা বেসিলারি আমাশয়। এদের সংক্রমণের কারণ ও রোগের লক্ষণ ভিন্ন ।

আমযুক্ত বা এমিবিক আমাশয়	**রোগের লক্ষণ**
এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা (Entamoeba histolytica) নামক পরজীব অ্যামিবার সংক্রমণে আমযুক্ত আমাশয় হয়। এই পরজীবী মাটিতে ও পানিতে থাকে। পানি বা খাবারের মাধ্যমে পেটে ঢুকে পরিপাকতন্ত্রে সংক্রামণ ঘটায়। সাধারণত বড় ছেলে-মেয়েরা এই পরজীবি দিয়ে বেশী আক্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে আক্রান্তের প্রবণতা কম।	বারবার পায়খানা হয় পায়খানার সাথে আম (মিউকাস) যায় তলপেটে চিনচিন ব্যথা করে সাধারণত মলে রক্ত থাকে না বমি বমি লাগতে পারে।

আমযুক্ত বা এমিবিক আমাশয়	রোগের লক্ষণ
সিগেলা (Shigella) নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে রক্ত আমাশয় হয়। এই রোগের উৎস আক্রান্ত ব্যক্তির মল। মাছির মাধ্যমে প্রধানত এই রোগের জীবাণু খাবার ও পানিতে সংক্রমিত হয়।	পেটে ব্যথা ও খিঁচুনি থাকে। ঘন ঘন নরম পায়খানা হয়। রোগীর জ্বর হয়। দুর্বলতা দেখা দেয়।

ধাপ - ৪: জন্ডিস

জন্ডিস (Jaundice) আসলে কোন রোগ নয়, এটি রোগের লক্ষণ মাত্র। রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে গেলে জন্ডিস দেখা দেয়।

রক্তের লোহিত কণিকাগুলো একটা সময়ে স্বাভাবিক নিয়মেই ভেঙ্গে গিয়ে বিলিরুবিন তৈরী করে, যা যকৃতে প্রক্রিয়াজাত হয়ে পরিপাকতন্ত্রে প্রবেশ করে। অন্ত্র থেকে বিলিরুবিন পায়খানার মাধ্যমে বেরিয়ে যায়।

উপসর্গ

- জন্ডিস হলে ত্বক ও চোখের সাদা অংশ হলুদ হয়ে যায়
- ক্ষুদামান্দ্য, অরুচি, বমি ভাব হয়
- জ্বর জ্বর অনুভূত হয়
- মৃদু বা তীব্র পেট ব্যথা হয়
- প্রস্রাবের রঙ হলুদ হয়ে যায়।

এ সব উপসর্গ দেখা দিলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। চিকিৎসক শারীরিক লক্ষণ এবং রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে জন্ডিসের তীব্রতা ও কারণ নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিবেন।

প্রতিরোধ

হেপাটাইটিস ভাইরাসে আক্রান্ত হলে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে যায়; জন্ডিস দেখা দেয়। হেপাটাইটিস-'এ' ও 'ই' খাদ্য ও পানির মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। আর 'বি', 'সি' এবং 'ডি' দূষিত রক্ত, ব্যবহৃত সিরিঞ্জ এবং আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের মাধ্যমে ছড়ায়।

১. সব সময় নিরাপদ খাদ্য ও পানি খেতে হবে
২. শরীরে রক্ত নেয়ার দরকার হলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় স্ক্রিনিং করে নিতে হবে
৩. সব সময় ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে
৪. নেশাদ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে
৫. কল কারখানার রাসায়নিক পদার্থ থেকে দূরে থাকতে হবে
৬. হেপাটাইটিস এ এবং বি-এর ভ্যাকসিন গ্রহণ করতে হবে।

ধাপ - ৫: টাইফয়েড

টাইফয়েড বা টাইফয়েড জ্বর একটি সংক্রামক রোগ যা সালমোনেলা টাইফি (Salmonella typhi) নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে হয়। সাধারণত দূষিত খাবার বা পানির মাধ্যমে এই রোগের জীবাণু ছড়ায়। আবার আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসলেও এ রোগ হতে পারে। সাধারণত ১ থেকে ৩ সপ্তাহ পরে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগের সাধারণ লক্ষণসমূহের মধ্যে আছে জ্বর, মাথা ব্যথা, বুকের উপর গোলাপি দাগ, লিভার বা প্লিহা বড় হয়ে যাওয়া. ডায়রিয়া কিংবা কোষ্ঠ্যকাঠিন্য ইত্যাদি।

টাইফয়েড রোগ কিভাবে ছড়ায়:

- দূষিত পানি বা খাবারের মাধ্যমে টাইফয়েড রোগের জীবাণু ছড়ায়
- আক্রান্ত ব্যক্তির পায়খানা আবার কখনও কখনও প্রস্রাবে টাইফয়েড রোগের জীবাণু থাকে। তাদের পায়খানা বা প্রস্রাবের মাধ্যমে টাইফয়েড ছড়ায়
- আক্রান্ত ব্যক্তি টয়লেট ব্যবহারের পর ভালভাবে হাত না ধুয়ে খাবার স্পর্শ করলে খাবার জীবাণুযুক্ত হয় এবং ছড়ায়
- আক্রান্ত ব্যক্তি ভালভাবে হাত না ধুয়ে খাবার পরিবেশন করলে টাইফয়েডের জীবাণু ছড়ায়
- সঠিক পানি ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার অভাবে মানুষের বর্জ্য পানির সাথে মিশে টাইফয়েড রোগের জীবাণু ছড়ায়
- অপরিস্কার শাক-সবজি বা ফল-মূলের মাধ্যমে টাইফয়েড রোগ ছড়ায়।

টাইফয়েড রোগের লক্ষণ

- গলা ব্যথা, পেট ব্যথা, মাথাব্যথা, মাথা ঝিমঝিম করা, শরীর ব্যথা ইত্যাদি অনুভূত হয়
- শরীর দূর্বল বা অবসাদ বোধ কাজ করে
- বমি বমি ভাব বা বমি হতে পারে
- জ্বর বাড়তে থাকে (১০৩-১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে)
- ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে
- রোগী প্রলাপ বকতে পারে বা অবচেতনও হয়ে যেতে পারে
- শরীরের ওজন দ্রুত কমতে থাকে
- পেটের ওপরের দিক বা পিঠে লালচে বা গোলাপি দাগ হতে পারে।

টাইফয়েড রোগ হলে করণীয়ঃ

টাইফয়েড ধরা পড়লে চিকিৎসকের পরামর্শ মত সঠিক চিকিৎসা করতে হবে। এছাড়া যেসব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তা হলো:

- রোগীকে পুষ্টিকর ও সুষম খাবার খেতে/দিতে হবে
- পর্যাপ্ত পানি ও তরল খাবার খেতে হবে
- সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে।

টাইফয়েড রোগ প্রতিরোধে করণীয়:

- নিরাপদ পানি ও খাবার খেতে হবে
- খাবার আগে ও টয়লেট ব্যবহারের পর ভালভাবে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে
- শাক-সবজি ও ফল-মূল নিরাপদ পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে খেতে হবে
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে ও পরিষ্কার পোশাক পড়তে হবে
- স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট ব্যবহার করতে হবে
- টাইফয়েড আক্রান্ত ব্যক্তিকে খাবার রান্না করা ও পরিবেশন করা হতে বিরত রাখতে হবে
- ঘরের ব্যবহৃত জিনিসপত্র নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিস আলাদা করতে হবে
- গরম খাবার খাওয়া ভাল
- প্রয়োজনে টাইফয়েডের টিকা নিতে হবে।

ধাপ - ৬: সারসংক্ষেপ

পানিবাহিত এইসব রোগ শুধুমাত্র আমাদেরকে শারীরিকভাবে অসুস্থই করে না, এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে। এছাড়াও পানিবাহিত এই রোগগুলো সংক্রমিত একজন থেকে আরেকজনে সংক্রমণ ঘটাতে পারে। তাই আমাদের উচিত যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা এবং নিজে ব্যক্তিগতভাবে, পরিবারের সবাইকে নিয়ে এবং স্কুল পরিবেশেও এই চর্চা বজায় রাখা।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন:

১) পানি ও খাদ্যবাহিত রোগ কি? কয়েকটি পানি ও খাদ্যবাহিত রোগের নাম বল?
২) ডায়রিয়া কি? কিভাবে ডায়রিয়া হয়? কিভাবে ডায়রিয়া প্রতিরোধ করা যায়?
৩) ডায়রিয়া রোগীর কেন পানি স্বল্পতা হয়? মারাত্মক ও স্বল্প পানি স্বল্পতার (Severe dehydration) লক্ষণগুলো বল? খাবার স্যালাইন বানানোর পদ্ধতি কি কি জানো?
৪) আমাশয় কি ও কত প্রকার? আমাশয় রোগের লক্ষণ আলোচনা কর?
৫) জন্ডিস কি? জন্ডিসের লক্ষণ বা উপসর্গ গুলো কি কি?
৬) কীভাবে জন্ডিস প্রতিরোধ করা যায়?
৭) টাইফয়েড কি? এ রোগের লক্ষণগুলো কি কি?
৮) টাইফয়েড কীভাবে ছড়ায় ও প্রতিরোধে করণীয় কি?

অধ্যায় - ২১: ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ

সময়: ৪৫ মিনিট

উদ্দেশ্য: অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীরা ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ সর্ম্পকে জানতে ও বুঝতে পারবে এবং প্রতিরোধে কি করতে হয় তা বলতে পারবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	সংক্রামক রোগ	৫ মিনিট	প্রশ্নোত্তর, স্লাইড বিশ্লেষণ	ফ্লিপশিট, মার্কার মাল্টিমিডিয়া
২.	নিপাহ	৫ মিনিট	প্রশ্নোত্তর, স্লাইড বিশ্লেষণ	ফ্লিপশিট, মার্কার মাল্টিমিডিয়া
৩.	কোভিড-১৯	১৫ মিনিট	আলোচনা, স্লাইড বিশ্লেষণ	ফ্লিপশিট, মার্কার মাল্টিমিডিয়া
৪.	ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়া	১৫ মিনিট	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, স্লাইড বিশ্লেষণ	ভিপ বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
৫.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট		

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষকের জন্য সহায়ক তথ্য:

ধাপ - ১: সংক্রামক রোগ

ভাইরাসজনিত সংক্রমক রোগগুলো মূলত: প্রতিরোধমূলক। আক্রান্ত হওয়ার পর লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি কাজে দেয়, তবে প্রতিরোধ ব্যবস্থাই বেশী কাজে দেয়। বর্তমানে পৃথিবীতে যেসব ভাইরাস মানুষকে সংক্রমিত করার পর্যায়ে রয়েছে তার অনেকগুলোরই প্রতিরোধমূলক টিকা আবিস্কার হয়েছে। তবে অনেকগুলোর প্রতিরোধ মূলক টিকা এখনও আবিস্কার করা যায়নি অথবা আবিস্কারের পর্যায়ে রয়েছে।

এই অবস্থায় এইসব ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া যায়; এখন সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ছাত্র/ছাত্রীরা সেশন শেষে সংক্রামক রোগ বলতে কী বুঝি তা জানতে পারবে

ভাইরাস জনিত সংক্রামক রোগ

কোন নির্দিষ্ট জীবাণু বা জীবাণু থেকে নির্গত বিষাক্ত পদার্থ যখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষ থেকে মানুষে, প্রাণী থেকে প্রাণীতে বা বায়ু ও পানি দ্বারা বাহিত হয়ে যে রোগের সৃষ্টি করে তাকে সংক্রামক রোগ বলে।

অনুকূল পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রকমের রোগবাহকের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবাণু একজন সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে সেখানে বংশবৃদ্ধি করে ও তাকে রোগাক্রান্ত করে এবং সুযোগ পেলেই অন্য আরেকজন সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। এভাবে সংক্রামক রোগ দ্রুত ছড়াতে পারে।

সাধারণত পানি, বাতাস, কীটপতঙ্গ (মশা-মাছি), স্থলচর ও জলচর প্রাণী (ইঁদুর, কুকুর, শামুক ইত্যাদি), সংক্রমিত মানুষ ও প্রাণীর সংস্পর্শে আসা, জড়বস্তু (মাটি, নিত্য ব্যবহার্য গৃহস্থালী সামগ্রী) রোগবাহকের কাজ করে থাকে।

ধাপ - ২: নিপাহ

ছাত্র/ছাত্রীরা সেশন শেষে নিপাহ ভাইরাস সংক্রমণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে জানতে পারবে

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

নিপাহ

নিপাহ একটি ভাইরাসজনিত রোগ, যা বাদুর থেকে মানুষে সংক্রমিত হয়। এ রোগের প্রধান লক্ষণগুলো হচ্ছে- জ্বরসহ মাথাব্যাথা, খিঁচুনি, প্রলাপ বকা, অজ্ঞান হওয়াসহ কোন কোন ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট।

নিপাহ রোগ প্রতিরোধে সকলকে নীচের নিয়মাবলী অনুসরণের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে-

- খেজুরের কাঁচা রস খাওয়া যাবে না
- কোন ধরণের আংশিক খাওয়া ফল খাওয়া যাবে না
- ফলমূল পরিস্কার পানি দিয়ে ভাল মতো ধুয়ে খেতে হবে
- রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব নিকটস্থ সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে
- আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসার পর সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে।

ধাপ - ৩: কোভিড-১৯

ছাত্র-ছাত্রীরা সেশন শেষে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে জানতে পারবে।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

নভেল করোনা ভাইরাস অনেক প্রজাতির নভেল করোনা ভাইরাসের মধ্যে যে ৭টি মানুষের দেহে সংক্রমিত হতে পারে তার একটি ২০১৯ নভেল করোনা ভাইরাস।

যেভাবে ছড়ায়:

- এই ভাইরাস কোন একটি প্রাণী থেকে মানুষের দেহে ঢুকেছে
- এখন মানুষ হতে মানুষে সংক্রমণ হচ্ছে

করোনা ভাইরাস মানুষের ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায় এবং

- শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে (হাঁচি/কাশি/কফ/থুথু) অথবা
- আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসলে একজন থেকে আরেকজনে ছড়ায়।

লক্ষণসমূহ:

- ভাইরাস শরীরে ঢোকার পর সংক্রমণের লক্ষণ প্রকাশ পেতে প্রায় ২-১৪ দিন সময় লাগে
- বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রথম লক্ষণ জ্বর
- এছাড়া শুকনো কাশি/গলা ব্যথা হতে পারে
- শ্বাসকষ্ট/নিউমোনিয়া দেখা দিতে পারে
- অন্যান্য অসুস্থতা (ডায়াবেটিস/উচ্চ রক্তচাপ/শ্বাসকষ্ট/হৃদরোগ/কিডনী সমস্যা/ক্যান্সার ইত্যাদি) থাকলে অরগ্যান ফেইলিওর বা দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ বিকল হতে পারে।

কোভিড-১৯ সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রতিকার:

- ইতোমধ্যে এই ভাইরাসের টিকা/ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বাংলাদেশে তার প্রয়োগ শুরু হয়েছে
- করোনা ভাইরাসের লক্ষণ দেখা দেয়া মাত্রই পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে
- শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়ামাত্রই 'আইসোলেশন'-এ যেতে হবে।

প্রতিরোধে করণীয়:

ব্যক্তিগত সচেতনতা-

- ঘন ঘন সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে (অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে)
- অপরিস্কার হাতে চোখ, নাক ও মুখ স্পর্শ করা যাবে না
- সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে
- হাঁচি/কাশির শিষ্টাচার মেনে চলতে হবে (হাঁচি/কাশির সময় বাহু/টিস্যু/রুমাল দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে রাখতে হবে)
- বাহিরে যাওয়া অত্যাবশ্যক হলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে
- শারীরিক দূরত্ব (কমপক্ষে ৩ ফুট) বজায় রাখতে হবে
- মাছ-মাংস ভালভাবে রান্না করে খেতে হবে
- ভ্রমণে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

কিশোর-কিশোরীদের মাঝে করোনা মহামারীকালের প্রভাব:

- কোভিড-১৯ সংক্রমণের এই সময়টিতে কিশোর-কিশোরীরা ঘরে থাকছে। অনলাইনে ক্লাস করছে। স্কুলে যেতে না পারা, বন্ধুদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে না পারা এবং করোনা সংক্রমণের ভীতিতে তারাও মানসিক চাপে থাকছে
- এ সময় মেজাজ খিটখিটে হতে পারে, ঘুমের রুটিন এলোমেলো হতে পারে, উদ্বিগ্নতা, আতংক, মানসিক চাপ আর বিষন্নতার লক্ষণ দেখা দিতে পারে
- স্বাস্থ্য বিধি যেমন- মাস্ক ব্যবহার, বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, কোন কারণে বাইরে যেতে হলে শারীরিক দূরত্ব রক্ষা করার বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে
- মানসিক চাপ মুক্ত রাখার জন্য নিজেকে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখবে- বাড়ির কাজে বড়দের সাহায্য করা, বাড়ির সবাইকে নিয়ে লুডু, ক্যারাম বা দাবা খেলা, সৃজনশীল কাজ যেমন ছবি আঁকা, লেখালেখি করা যেতে পারে
- দৈনন্দিন রুটিনগুলো যথা সম্ভব মেনে চলতে হবে- সময়মত রাতে ঘুমানো আর দিনে সক্রিয় থাকা, সময়মত খাওয়া ইত্যাদি
- অনলাইনে বন্ধু বা শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে; তবে নিয়ম মেনে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হবে যাতে আসক্তির সৃষ্টি না হয়
- পরিবারের কেউ অসুস্থ বোধ করলে তাকে করণীয় বিষয়ে জানাতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে হবে।

ধাপ - ৪: ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়া

ছাত্র/ছাত্রীরা সেশন শেষে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার সংক্রমণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে জানতে পারবে।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া মূলতঃ ভাইরাসজনিত রোগ, যা সংক্রমিত এডিস ইজিপ্ট এবং এডিস অ্যালবোপিক্টাস মশার কামড়ে মানবদেহে ছড়িয়ে থাকে। এই মশা বাড়ির ভিতর ও বাহিরে পাত্র অথবা অন্য কোথাও জমে থাকা স্বচ্ছ পানিতে জন্মায় ও বংশ বিস্তার করে। এ মশা সাধারণতঃ সূর্যের আলোতে দিনের বেলায় অর্থাৎ সকালে ও বিকেলে কামড়িয়ে থাকে। সাধারণ চিকিৎসাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া জ্বর ভালো হয়ে যায়। তবে হেমোরেজিক ডেঙ্গু ও ডেঙ্গু শক্ সিনড্রোম মারাত্মক হতে পারে এবং চিকুনগুনিয়ার ক্ষেত্রে গিটে ব্যথা অনেক দিন থাকতে পারে।

ডেঙ্গু জ্বর সংক্রমণের সময়কাল

- ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত ও সংক্রমিত ব্যক্তিকে কামড়ানোর ৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে এডিস মশাটি সংক্রমিত হয়
- সংক্রমিত মশাটি ৮ থেকে ১২ দিনের মধ্যে মানুষকে কামড়ালে ডেঙ্গু ভাইরাস মানুষের শরীরে সংক্রমিত হয়
- তবে মশাটি তার জীবনকাল পর্যন্ত সংক্রমিত অবস্থায় থেকে যায়
- সংক্রমিত এডিস মশাটি যে কোন সময় কামড়ালে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় সম্ভাবনা থেকে যায়।

ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণসমূহ

ডেঙ্গু জ্বর হঠাৎ শুরু হয়ে ৩ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে এবং জ্বর ১০৪-১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত হতে পারে। ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণসমূহ হলো-

- তীব্র জ্বর ও মাথা ব্যথা
- মাংসপেশী ও জয়েন্টে ব্যথা
- চোখ ও চোখের পিছনে ব্যাথা
- গ্রন্থি ফোলা
- চামড়ায় লালচে ছোপ বা র‍্যাশ (ফুসকুড়ি)
- বমি বমি ভাব এবং বমি হওয়া।

চিকুনগুনিয়া কিভাবে ছড়ায়

চিকুনগুনিয়া মূলতঃ ভাইরাসজনিত রোগ, যা চিকুনগুনিয়া সংক্রমিত স্ত্রী এডিস মশার কামড়ের মাধ্যমে মানুষ থেকে মানুষের দেহে ছড়িয়ে থাকে। এডিস মশা কামড়ের ৩ থেকে ৭ দিনের মধ্যে চিকুনগুনিয়া ভাইরাস সংক্রমিত হয়।

চিকুনগুনিয়ার লক্ষণসমূহ

ডেঙ্গু জ্বর হঠাৎ শুরু হয়ে ৩ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে এবং জ্বর ১০৪-১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত হতে পারে। ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণসমূহ হলো-

- হঠাৎ জ্বর (১০৪ ডিগ্রী পর্যন্ত হতে পারে)
- গিটে ব্যাথা
- প্রচন্ড মাথা ব্যাথা
- মাংসপেশীতে ব্যাথা
- শরীরে শীত শীত অনুভূতি
- চামড়ায় লালচে দানা বা র‍্যাশ
- জয়েন্ট বা গিট ফুলে যাওয়া
- বমি ভাব অথবা বমি ও ডায়রিয়া
- মুখে ঘা, চোখ জ্বলা, অবসাদ ও অনিদ্রা
- খাবারে অরুচি ও দুর্বলতা।

চিকুনগুনিয়া ও ডেঙ্গু প্রতিরোধের উপায়সমূহ

- এডিস মশার বিস্তার রোধে ফুলের টব, পরিত্যক্ত টায়ার, ডাবের খোসা, এসি ও ফ্রিজের তলায় ইত্যাদিতে পানি জমতে দেয়া যাবে না
- বাড়ির আঙিনা, নির্মাণাধীন ভবনে পানির চৌবাচ্চা এবং পানি জমে থাকতে পারে এমন স্থানগুলো নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে
- বাড়তি সতর্কতা হিসাবে দিনের বেলায়ও ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করতে হবে এবং ফুল হাতা কাপড় পরিধান করতে হবে
- এডিস মশার প্রজননের স্থানগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং অবশ্যই মশা নিধনের ঔষধ ব্যবহার করতে হবে
- এডিস মশা যাতে কক্ষে ঢুকতে না পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে
- চিকুনগুনিয়া ও ডেঙ্গু প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে হবে।

ধাপ - ৫: সারসংক্ষেপ

বিশ্বব্যাপী ভাইরাসজনিত সংক্রমক রোগের প্রার্দূভাব বেড়েছে এবং নতুন নতুন রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। এখানে যে চারটি রোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার প্রতিটিই বিগত কয়েক বছরে বা অতিসম্প্রতি আবিস্কৃত। কিশোর-কিশোরীদের সংক্রমক রোগ সম্পর্কে ধারণা তাদের নিজেদের সুস্থ রাখতে যেমন সহায়তা করবে তেমনি তারা তাদের সহপাঠী, পরিবার ও প্রতিবেশীদেরও সুস্থ থাকতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন:

১) ভাইরাস জনিত সংক্রমক রোগ কি? কয়েকটি ভাইরাস জনিত সংক্রমক রোগের নাম বলো?
২) নিপাহ কি? কিভাবে নিপাহ প্রতিরোধ করা যায়?
৩) কোভিড-১৯ কি? কোভিড-১৯ কিভাবে ছড়ায় এবং কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়?
৪) কোভিড-১৯ সংক্রমণের লক্ষণ গুলো কি কি? কিশোর-কিশোরীদের মাঝে করোনা মহামারীরর প্রভাব আলোচনা কর।
৫) কোন মশা দ্বারা ডেঙ্গু বা চিকুনগুনিয়া রোগ ছড়ায়? ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া রোগ কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়?
৬) ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া রোগের লক্ষণসমূহ আলোচনা কর?

শিশুর বিকাশ

অধ্যায় - ২২: শিশুর বিকাশে প্রতিবন্ধকতা ঃ অটিজম

সময়: ৪৫ মিনিট

উদ্দেশ্য: শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে যার মধ্যে অটিজম একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ছাত্র-ছাত্রীরা অটিজম বলতে কি বোঝায় এবং এর উপসর্গ কি সে সম্পর্কে একজন অটিজম শিশুর সীমাবদ্ধতা ও আচার-আচরণের সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারবে। সেই সাথে একজন অটিজম শিশুর কিছু বিশেষ গুণাবলীও রয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা পাবে। অটিজম সচেতন হবে এবং অটিজম শিশুদের জন্য সহমর্মী হয়ে উঠবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	অটিজম কী	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা, স্লাইড বিশ্লেষণ	ফ্লিপশিট, মাল্টিমিডিয়া
২.	অটিজমের লক্ষণ ও কারণ	১০ মিনিট	আলোচনা, স্লাইড বিশ্লেষণ	মাল্টিমিডিয়া
৩.	অটিজম সমস্যায় করণীয়	৫ মিনিট	আলোচনা, স্লাইড বিশ্লেষণ	মাল্টিমিডিয়া
৪.	অটিজম আছে এমন শিশুর মা বাবার জন্য পরামর্শ	১৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা, স্লাইড বিশ্লেষণ	ফ্লিপশিট, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া
৫.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট	আলোচনা	ফ্লিপশিট

ধাপ - ১: অটিজম কি

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করে তাদের কাছ থেকে অটিজম সম্পর্কে কোন ধারণা আছে কিনা এবং অটিজম বলতে কি বোঝায় এবং এর কারণ কি কি সে সম্পর্কে উত্তর জানার চেষ্টা করবেন। উত্তরগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন এবং তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

অটিজম কী

ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞেস করুন, অটিজম সম্পর্কে তারা কী জানেন। অটিজম সম্পর্কে তারা এর আগে শুনেছেন কিনা। তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। ছাত্র-ছাত্রীদের মতামতের আলোকে স্লাইড দেখিয়ে অটিজম সম্পর্কে আলোচনা করুন। কোন প্রশ্ন থাকলে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করুন।

অটিজম কি

অটিজম শিশুদের মানসিক বিকাশজনিত সমস্যা যেখানে সামাজিক সম্পর্ক, যোগাযোগ এবং আচরণের পরিবর্তনই প্রধান বিষয়। যার লক্ষণ সাধারণতঃ শিশুর জন্মের দেড় বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে প্রকাশ পায়। অটিজম থাকলে শিশু তার পরিবেশের সাথে যথাযথভাবে যোগাযোগ করতে পারে না। তারা ভাষার ব্যবহার রপ্ত করতে পারে না, নিজের ভেতর গুটিয়ে থাকে, সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না, আচরণের সমস্যা দেখা দেয় এবং একই কাজ বা আচরণ বার বার করতে থাকে বা হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে উঠে।

বিশ্বে প্রতি ১১০ জনে ১ জন শিশু এ সমস্যায় ভুগছে। বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যে অটিজমের হার প্রায় ০.৮ শতাংশ, অর্থাৎ প্রতি হাজারে ৮ জন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশনের বিভিন্ন রোগ শনাক্তকরণের পদ্ধতিতে অটিজমকে একটি ব্যাপক বিকাশজনিত সমস্যা হিসেবে শ্রেণীভূক্ত করা হয়েছে।

ধাপ - ২: অটিজমের লক্ষণ ও কারণ

ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞেস করুন, অটিজমের লক্ষণ ও কারণ সম্পর্কে তারা কিছু জানেন কিনা। অটিজমের লক্ষণ ও কারণগুলো কি কি। তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। ছাত্র-ছাত্রীদের মতামতের আলোকে স্লাইড দেখিয়ে অটিজমের লক্ষণ ও কারণ সম্পর্কে আলোচনা করুন। কোন প্রশ্ন থাকলে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করুন।

অটিজমের কারণ

অটিজমের সঠিক কারণ এখন পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি।

অটিজম কাদের হয়

যে কোনো শিশুর অটিজম হতে পারে। মেয়ে শিশুদের তুলনায় ছেলে শিশুদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রায় চার গুণ বেশি। সাধারণত শিশুর বয়স ৩ বছর হবার আগেই (অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৮ মাস থেকে ৩৮ মাস বয়সের মধ্যেই) অটিজমের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। বাবা মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা বা শিশুর প্রতি বাবা-মায়ের ব্যবহার এসবের সাথে শিশুর অটিজম হবার কোনো সম্পর্ক পাওয়া যায়নি। তাই শিশুর অটিজম থাকলে কোনোভাবেই বাবা-মায়েরা যেন নিজেদের দায়ী না করেন বা নিজেদের অপরাধী মনে না করেন।

অটিজম এর সাধারণ লক্ষণ

- ১২ মাস বয়সেও তার নাম ধরে ডাকলে প্রতিক্রিয়া করে না
- ১৮ মাস বয়সে খেলতে পারে না
- এরা সাধারণত অন্যের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকানো এড়িয়ে যায় এবং একা থাকতে পছন্দ করে
- এই শিশুরা অন্য মানুষের অনুভূতি বুঝতে পারে না। তাদের নিজস্ব অনুভূতি নিয়ে কথা বলতে অসুবিধা অনুভব করে
- এই শিশুরা দেরি করে কথা বলা এবং ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করতে পারে
- শিশু একা একা আপন মনে খেলে, অন্য শিশুর সাথে খেলে না
- শব্দ বা ছোট ছোট বাক্য বার বার বলতে থাকে (ইকোলালিয়া)
- প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গতি নেই এমন উত্তর দেয়
- কোনো ছোটোখাটো পরিবর্তন পছন্দ করে না। একই নিয়মে চলতে পছন্দ করে
- কোনো বিষয় বা বস্তুর প্রতি অতিমাত্রায় আগ্রহ দেখায়
- কিছু কিছু সময় তারা তাদের দুই হাতে ঝাপটা মারতে থাকে, তাদের শরীর দোলাতে থাকে, অথবা চক্রাকারে ঘোরাতে থাকে
- কিছু শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, চেহারা বা অনুভবের সঙ্গে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

অটিজম শিশুদের কিছু সীমাবদ্ধতা

- বধিরতা
- স্পর্শ, শব্দ, আলো, রং, স্বাদ এবং গন্ধে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া
- কিছু কিছু খাবারে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া
- মানুষের স্পর্শে অস্বস্তি বোধ করা।

অটিজম শিশুদের আচার-আচরণের সমস্যা

- নিয়ম মেনে চলতে না পারা
- খেলনা বা কোনো জিনিসের প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণ
- বিপদ বুঝতে না পারা, অথচ সাধারণ জিনিসকে ভয় পাওয়া
- একই খেলা বার বার খেলা
- বিনা কারণে মেজাজ পাল্টে যাওয়া - অত্যধিক হাসি বা কান্না। মাংসপেশির অস্বাভাবিক চঞ্চলতা এই অসুস্থতার অন্তর্ভূক্ত
- যেকোনো পরিবর্তন জেদ বা প্রচন্ড রাগের কারণ হতে পারে
- কোনো কাজে মন বসাতে না পারা
- খাওয়া-দাওয়া নিয়ে সমস্যা।

ধাপ - ৩: অটিজম সমস্যায় করণীয়

অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, অটিজম সমস্যায় করণীয়গুলো কি কি হতে পারে। তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। অংশগ্রহণকারীদের মতামতের আলোকে স্লাইড দেখিয়ে অটিজম সমস্যায় করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করুন। কোন প্রশ্ন থাকলে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করুন।

অটিজম কারা নির্ণয় করবেন

কোনো শিশুর মধ্যে অটিজমের কিছু লক্ষণ থাকলেই তার অটিজম আছে এমন সিদ্ধান্ত দ্রুত নেয়া যাবে না। কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকই বলতে পারবেন শিশুটির অটিজম আছে কিনা। শিশু বিশেষজ্ঞ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, শিশু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, শিশু স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ, কিংবা অটিজম-এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকই অটিজম নির্ণয় করবেন। তাই এ ধরণের চিকিৎসকের মতামত পাবার আগে কোনো শিশুর অটিজম আছে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। তবে মাঠকর্মীগণ নিকটবর্তী অঞ্চলে বিশেষায়িত চিকিৎসাকেন্দ্র বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকলে নিকটস্থ উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র/জেলা সদর হাসপাতালে যোগাযোগ করবেন। মনে রাখতে হবে অটিজম নির্ণয়ের জন্য সুস্পষ্ট কোনো পরীক্ষা আবিষ্কৃত হয়নি- এটি নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসকের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাই যথেষ্ট। তবে অটিজম বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরণের মনো-বৈজ্ঞানিক পরিমাপকের সাহায্যে অটিজম শণাক্তকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। কোনো বই পড়ে, পত্রিকার স্বাস্থ্য পাতা পড়ে নিজে নিজে কোনো শিশুর অটিজম নির্ণয় করা যাবে না। মাঠকর্মীগণ প্রাথমিকভাবে অটিজম শণাক্তকরণ ও শিশুর পরিচর্যায় অংশ নিতে বিশেষভাবে সাহায্য করবেন।

ধাপ - ৪: অটিজম আছে এমন শিশুর মা-বাবার জন্য পরামর্শ

অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, তারা অটিজমের পরিচর্যা বলতে কী বোঝেন। অটিজমের পরিচর্যাগুলো কি কি। তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। অংশগ্রহণকারীদের মতামতের আলোকে স্লাইড দেখিয়ে অটিজমের পরিচর্যা সম্পর্কে আলোচনা করুন। কোন প্রশ্ন থাকলে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করুন।

অটিজম-এর সুনির্দিষ্ট পরিচর্যা ও সেবা

আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, অটিজম রয়েছে এমন শিশুদের মধ্যে ১০-২০% শিশু ৪ থেকে ৬ বছর বয়সের মধ্যে মোটামুটি স্বাবলম্বী হতে পারে এবং সাধারণ স্কুলে স্বাভাবিক শিশুদের সাথে পড়ালেখা করতে পারে। আরো ১০-২০% শিশু স্বাভাবিক শিশুদের সাথে পড়ালেখা করতে পারে না, তারা বাসায় থাকে বা তাদের জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষায়িত স্কুল ও বিশেষ প্রশিক্ষণের; বিশেষায়িত স্কুলে পড়ে, ভাষাসহ বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তারা সমাজে মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থান করে নেয়। তবে বাকি শিশুরা সব ধরণের সহায়তা পাওয়ার পরও স্বাধীনভাবে স্বাবলম্বী জীবন অতিবাহিত করতে পারে না। তাদের জন্য প্রয়োজন হয় দীর্ঘদিনের- প্রায় সারাজীবনের জন্য অন্যের উপর নির্ভরতা এবং বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন হয় তাদের।

তিনটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রেখে শিশুর অটিজমের ব্যবস্থা দেয়া হয়

প্রথমত-

অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ পরিবর্তনের জন্য শিশুর বাবা মাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন; যাতে তারা বাড়িতে শিশুর আচরণগত পরিবর্তন আনতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন। শিশুর অনাকাংক্ষিত আচরণের দিকে মনোযোগ না দিয়ে কাঙ্খিত আচরণকে উৎসাহিত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত-

এসব শিশুদের মূলধারার স্কুলে শিক্ষা প্রদান করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে বিশেষ সহায়তা প্রদান করতে হবে। যে সমস্ত শিশু মূলধারার স্কুলে যেতে সক্ষম নয় তাদেরকে বিশেষায়িত স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যারা একেবারেই স্কুলে যেতে অক্ষম তাদের জন্য বাড়িতে উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

তৃতীয়ত-

ছোট ছোট শব্দ দিয়ে তার ভাষার দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। তার সাথে স্বাভাবিকভাবে স্পষ্ট করে কথা বলতে হবে। প্রয়োজনে তাকে ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে সাহায্য করতে হবে এবং ইশারার তাৎপর্য বোঝাতে হবে। ছড়া, কবিতা, দৈনন্দিন ব্যবহারিক জিনিসপত্রের নাম, ছবির কার্ড ব্যবহার করা, গান, পাখির নাম, রঙের নাম, ফুলের নাম ইত্যাদি শেখাতে হবে। শিশুকে কোনো শব্দ বিকৃত করে না শিখিয়ে প্রকৃত উচ্চারণ শেখাতে হবে।

স্পীচ-ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপী ও অকুপেশনাল থেরাপী এবং আবেগ ও আচরণগত সমস্যার জন্য বিহেভিয়ার থেরাপী, সাইকোথেরাপির প্রয়োগ করতে হবে।

কেনো কোনো ক্ষেত্রে ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে- তবে তা অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী হতে হবে। অটিজম-এর সাথে কোনো ধরণের শারীরিক বা মানসিক সমস্যা থাকলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেগুলোর চিকিৎসাও গ্রহণ করতে হবে।

অটিজম রয়েছে এমন শিশুদের জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরের সচেতনতা আর অটিজম নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। আর এই সচেতনতা ও পরিবর্তনের প্রথম ধাপটি শুরু করতে হবে পরিবার থেকেই। অটিজমের চিকিৎসায় পরিবারের- বিশেষত বাবা মায়েদের ভূমিকা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিশুর অটিজমকে গুরুত্বের সাথে নিতে হবে, সেই সাথে নিতে হবে মানসিক প্রস্তুতি। অভিভাবকদের ইতিবাচক এবং গঠনমূলক আচরণই পারে অটিজম আছে এমন শিশুর বিকাশের পথকে অনেকখানি স্বাভাবিক ও সাবলীল করতে।

কোথায় বিশেষ সহায়তা পাওয়া যাবে

- জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, শিশু মনোরোগ বিভাগ ও 'চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিক', শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, 'সেন্টার ফর নিউরো ডেভেলপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিলড্রেন' বিভাগ, শাহবাগ, ঢাকা

- অটিজম রিসোর্স সেন্টার, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর, ঢাকা
- শিশু বিকাশ কেন্দ্র, শিশু মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকা
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মনোরোগ বিদ্যা বিভাগ
- শিশু বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ
- ঢাকা শিশু হাসপাতাল, 'শিশু বিকাশ কেন্দ্র', ঢাকা
- মানসিক রোগ বিভাগ, সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
- শিশু বিভাগ, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
- সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, শিশু ও মানসিক রোগ বিভাগ, ঢাকা
- সরকার অনুমোদিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও বিশেষায়িত স্কুলসমূহ।

ধাপ - ৫: সারসংক্ষেপ

শিশুর বিকাশে একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা অটিজম নিয়ে এই আলোচনা ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষভাবে সহায়তা করবে। প্রথমত: তারা নিজেরা সচেতন হবে এবং অটিজম লক্ষণ আছে এমন ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সহায়ক আচরণ করবে। দ্বিতীয়ত: তাদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবেশীদের কারও এই লক্ষণ থাকলে তার সাথেও সহায়ক আচরণ করবে। তৃতীয়ত: এই বিষয়ে তার ধারণা অন্যদের সাথে আলোচনা করবে এবং সচেতন করতে ভূমিকা রাখবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন:

১) অটিজম সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? অটিজম হওয়ার কি কোন কারণ আছে?

২) কোন শিশু অটিজম সমস্যায় ভূগছে কি না কীভাবে বুঝব? অটিজম শিশুর কি ধরণের সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে? অটিজম শিশু কি ধরণের আচরণ করতে পারে?

৩) কোন শিশু অটিজম সমস্যায় ভূগছে কি না কে নির্ধারণ করবেন? কোন তিনটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রেখে শিশুর অটিজমের ব্যবস্থা দেয়া হয়?

৪) অটিজম শিশুদের জন্য কোথায় বিশেষ সহায়তা পাওয়া যায়?

অধ্যায় - ২৩: শিশু বিকাশ ঃ বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোবৃত্তিয়

সময়: ১ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: ছাত্র-ছাত্রীরা শিশুর বিকাশ বলতে কি বোঝায় এবং এর ধাপগুলো কী কী সে সম্পর্কে জানতে পারবে। শিশুর মেধা বিকাশের কৌশল ও বাবা-মায়ের কি করণীয় সে সম্পর্কেও তারা ধারণা পাবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	শিশুর বিকাশ বলতে কি বোঝায়	৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং আলোচনা, প্রশ্নোত্তর	ব্ল্যাকবোর্ড
২.	শিশুর বিকাশের ধাপ (লক্ষণ, স্তর)	১৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং,আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
৩.	শিশুর স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশে বাধা	৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া, ব্ল্যাকবোর্ড
৪.	শিশুর মেধা বিকাশের কৌশল এবং খেলার ব্যবস্থা: মা-বাবা/অভিভাবকদের জন্য করণীয়	২০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া, ব্ল্যাকবোর্ড
৫.	শিশুর মেধা বিকাশে করণীয়: মা-বাবা/অভিভাবকদের জন্য	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া, ব্ল্যাকবোর্ড
৬.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট	আলোচনা	

ধাপ - ১: শিশুর বিকাশ বলতে কি বোঝায়:

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করে তাদের কাছ থেকে শিশুর বিকাশ বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে উত্তর জানার চেষ্টা করবেন। উত্তরগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন এবং তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

শিশুর বিকাশ বলতে কি বোঝায়?

শিশুর বিকাশ বলতে বোঝায় তার বুদ্ধিমত্তা, মানসিক এবং সামাজিক দিক থেকে তার যে কাজ করার দরকার সেই কাজ সে ঠিকঠাক করছে কি না এবং দক্ষতার বিকাশ হচ্ছে কি না। এটি তার মনোসামাজিক আচরণের দিক নির্দেশ করে। সুতরাং শিশুটির বৃদ্ধির ধরনে লক্ষ্য রাখা যতটা গুরুত্বপূর্ণ তেমনই তার বিকাশের দিকেও নজর রাখা ততটাই জরুরি। সেকারণে শিশুর বিকাশের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এই মাইলফলকগুলো অর্জনের স্বাভাবিক সীমা আছে এবং তা অর্জনের ক্ষেত্রে শিশুদের মধ্যে কিছু পার্থক্যও থাকতে পারে। শিশুর বৃদ্ধি কেমন হচ্ছে সেদিকে স্বাস্থ্যকর্মী যেমন নজর রাখবেন, তেমনই শিশুর বিকাশের মাইলফলকগুলোও তিনি পর্যবেক্ষণ করবেন। একই সাথে তিনি শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পর্কে মা এবং পরিবারের সদস্যদের শিক্ষিত করে তুলবেন যাতে শিশুটির মধ্যে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলতে তাঁরা সক্ষম হন।

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে। এর মধ্যে রয়েছে

- জিনগত কারণ, যেমন; জিনগত উত্তরাধিকার, বয়স, লিঙ্গ, জন্মের পরে মা ও শিশুর পুষ্টি
- পরিবেশগত কারণ, যেমন; ভালো বাসস্থান, সূর্যালোক, নিরাপদ পানীয় জল, ডায়রিয়ার মতো অসুখ এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করার মতো পরিবেশ ইত্যাদি
- পরিবারগত কারণ, যেমন; পরিবারের আয়তন, একাধিক শিশুর জন্মের ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান, গর্ভাবস্থায় যত্ন ইত্যাদি।

এই বিষয়গুলোর বেশির ভাগই পরিবার এবং বিশেষত নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বিকশিত করতে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখা জরুরি।

ধাপ - ২: শিশু বিকাশের ধাপ:

উপস্থাপক অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করবেন যে, শিশু বিকাশের ধাপগুলো কী কী? তাদের ধারণাগুলো নিয়ে বোর্ডে লিখবেন। তাদের ধারণাগুলো এবং সহায়ক তথ্যের সমন্বয়ে স্লাইড প্রদর্শন করে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

শিশু বিকাশের ধাপ

শিশুর বৃদ্ধি একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় শিশুর বৃদ্ধি পর্যায়ক্রমিক ক্রমোন্নতি ঘটে, যাকে বলা হয় শিশু বিকাশের স্তর। তবে বয়স অনুযায়ী শিশু কাজকর্ম করছে কি না সেদিকে প্রত্যেক মা-বাবার নিয়মিত নজর রাখা উচিত। কেননা সমবয়সী কোনো দুটি বাচ্চার বিকাশ সমগতিতে নাও হতে পারে। কখনো কখনো তার বিকাশ সমবয়সী অন্য বাচ্চাদের তুলনায় ধীরে হতে পারে। শিশু নিজে কোন কাজে প্রস্তুত না হলে তাকে জোর করলে কোনো উপকার হয় না। তাই প্রত্যেক অভিভাবকের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত।

শিশুর বিকাশের লক্ষণ

শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ হচ্ছে কি না তা কিছু লক্ষণ দেখে বোঝা যায়। যেমন:

২ মাস : কথা বললে হাসি দেয়া
৩ মাস : মাকে চিনতে পারা
৪ মাস : গলা জড়িয়ে ধরা, ঘুরে তাকানো
৫ মাস : কোনো জিনিসের কাছে গিয়ে তা ধরতে শেখা
৬ মাস : 'মা', 'বা', 'দা' শব্দ বলা
৮ মাস : কারো সাহায্য ছাড়া বসতে শেখা
৯ মাস : হামাগুড়ি দিতে শেখা
১২ মাস : দাঁড়াতে শেখা
১৩ মাস : কোনো সাহায্য নিয়ে হাঁটতে শেখা
২৪ মাস : সিঁড়ি দিয়ে ওঠা এবং ছোট ছোট বাক্য বলা
৩৬ মাস : তিন চাকার সাইকেলে চড়তে শেখা
৪৮ মাস : হাত দিয়ে বল ছোড়া এবং সিঁড়ির ধাপে পা রেখে ওঠা
৭২ মাস : দেখে দেখে জটিল কোনো ছবি বা আকৃতি আঁকতে শেখা।

শিশু বিকাশের স্তর

জন্মের পর থেকে ৬ সপ্তাহ

- শিশুর মাথা একদিকে ফিরিয়ে চিত হয়ে শোয়া
- হঠাৎ আওয়াজে চমকে যাওয়া বা শরীর স্থির হয়ে যাওয়া
- হাতের মুঠো বন্ধ করে থাকা
- বাচ্চার হাতের তালুতে কিছু ছোঁয়ালে সেটা ধরার চেষ্টা করা।

৬ থেকে ১২ সপ্তাহ

- নিজের মাথা স্থির করতে পারা
- চোখের দৃষ্টি কোনো জিনিসের ওপর স্থির করতে পারা।

৩ মাস

- চিত হয়ে শুয়ে বাচ্চা দুই হাত-পা সমানভাবে নাড়া। কান্নার আওয়াজ ছাড়াও বাচ্চা মুখ দিয়ে নানা রকম আওয়াজ করা
- শিশু তার মাকে চিনতে পারা এবং তার গলার আওয়াজে সাড়া দেয়া
- হাত প্রায়ই খোলা রাখা
- যখন সোজা করে তোলা হয় তখন শিশুর মাথা সোজা রাখতে পারা।

৬ মাস

- দুই হাত জড়ো করে খেলা
- আশপাশে শব্দ শুনলে মাথা ঘোরানো
- চিত থেকে উপুড় বা উপুড় থেকে চিত হতে পারা
- ঠেকা দিয়ে অল্প সময়ের জন্য বসতে পারা
- শিশুকে দাঁড় করিয়ে ধরলে পায়ের উপর ভার রাখতে পারা
- উপুড় হয়ে শুয়ে হাত-পা ছড়িয়ে নিজের শরীরের ভার নিতে পারা।

৯ মাস

- কোনো অবলম্বন বা ঠেকা ছাড়া বসতে পারা
- হাঁটু ও হাতের ওপর ভর করে হামাগুড়ি দিতে পারা।

১২ মাস

- বাচ্চা ঠেলে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা
- 'মা-মা' বলতে শুরু করা
- আসবাব ধরে বাচ্চা হাঁটতে পারা।

১৮ মাস

- সাহায্য ছাড়াই গ্লাস ধরতে পারা এবং তার থেকে পানি পান করতে পারা
- কোনোকিছুর সাহায্য ছাড়াই হাঁটতে পারা
- দু-একটা শব্দ বলতে পারা।

২ বছর

- না পড়ে গিয়ে দৌড়াতে পারা
- কোনো ছবি দেখে আনন্দিত হওয়া
- কী বলতে চায় তা বলতে পারা
- অন্যদের বলা কথা নকল করতে শুরু করা
- তার শরীরের কিছু কিছু অংশ চেনাতে পারা।

৩ বছর

- হাত তুলে বল ছুঁড়ে মারতে পারা (পাশের বা নিচের দিকে নয়)
- সাধারণ কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা যেমন; 'তুমি ছেলে, না মেয়ে?'
- কোনো জিনিস সরিয়ে রাখতে পারা
- অন্তত একটি রঙের নাম বলতে পারা।

৪ বছর

- সাইকেল প্যাডেল করতে পারা
- বই বা ম্যাগাজিনের ছবির নাম বলতে পারা।

৫ বছর

- তার জামাকাপড়ের বোতাম লাগাতে পারা
- অন্তত তিনটি রঙের নাম বলতে পারা
- পা বদল করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারা
- পা ফাঁক করে লাফাতে পারা।

ধাপ - ৩: শিশুর স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশে বাধা:

উপস্থাপক অংশগ্রহণকারীদের বলবেন যে, একজন শিশুর স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশ বিভিন্ন কারণে বাধাগ্রস্ত হতে পারে । ফলে তার ভিতরে কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। এর উপর সহায়ক তথ্য নিয়ে স্লাইড প্রদর্শন করে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

শিশুর স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশ যে কারণে বাধাগ্রস্ত হয়

১. জিনগত বা বংশগত কারণ
২. মায়েদের অসচেতনতা ও স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাব
৩. শিশুর বুদ্ধির বিকাশের সময় বিভিন্ন রোগ ও অত্যধিক ওষুধের ব্যবহার
৪. শিশুর বুদ্ধির বিকাশের প্রতি পারিবারিক, সামাজিক ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতার অভাব
৫. গর্ভবতী মায়ের অপুষ্টি
৬. শিশুকে ভালো কাজে প্রশংসা না করে সব সময় তিরস্কার বা নিন্দা করা
৭. শিশুকে পুষ্টিকর খাবার না খাওয়ানো
৮. এ ছাড়া শিশুর সামনে পারিবারিক ঝগড়া ও অশোভন আচরণ শিশুর বুদ্ধির বিকাশে অন্যতম অন্তরায়।

ধাপ - ৪: শিশুর মেধা বিকাশের কৌশল এবং খেলার ব্যবস্থা: মা-বাবা/অভিভাবকদের জন্য করণীয়

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের বলবেন যে, একজন শিশুর স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশ যেমনি বিভিন্ন কারণে বাধাগ্রস্ত হতে পারে ঠিক তেমনি মেধা বিকাশেরও কিছু কৌশল রয়েছে। সহায়ক তথ্য নিয়ে স্লাইড প্রদর্শন করে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

শিশুর মেধা বিকাশের কৌশল এবং খেলার ব্যবস্থা

০১. ছড়া, ছোটদের কবিতা বা গল্প শোনান

শিশুদের জন্য বাংলা ও ইংরেজিতে অসংখ্য ছড়া, কবিতা, গান এবং রূপকথার গল্প লেখা হয়েছে। এই ছড়া, কবিতাগুলো ছন্দে ছন্দে শিশুর সামনে আবৃত্তি করতে পারেন। এর ফলে শিশুর স্মৃতিশক্তি যেমন বাড়বে এবং কথা বলার জন্য তার শব্দ ভান্ডারে নতুন নতুন শব্দ যুক্ত হবে।

০২. বর্ণমালা ও সংখ্যার সঙ্গে পরিচয় করান

আপনার শিশু যখন কথা বলতে শিখবে এবং বিভিন্ন জিনিস চিনতে ও বুঝতে শিখবে, তখন তাকে বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন। বর্ণমালার অক্ষর চেনানোর পুরো প্রক্রিয়াটি যেন আনন্দময় হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। অক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যার ধারণাও শিশুদের দিতে হবে।

০৩. প্রাণী বা বস্তুর আওয়াজ শোনান

বিভিন্ন প্রাণী বা বস্তুর আওয়াজ যে আলাদা হয়; শিশুকে তা বুঝতে সহযোগিতা করুন। এর ফলে শিশুরা বিভিন্ন ধরনের শব্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলাদা করে প্রাণীদের চিনতেও পারবে।

০৪. আকৃতি ও রঙ বিষয়ে ধারণা দিন

আমাদের চারপাশের প্রতিটি জিনিসের যে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও রঙ রয়েছে তা খেলার ছলে শিশুকে শেখান। ধরুন, আপনার শিশুর সঙ্গে আপনি একটি বল নিয়ে খেলছেন। তাকে বলতে পারেন, এটা একটা বল ও এটার রঙ লাল আর বলটি গোল।

০৫. নিজ থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দিন

শিশুর সব কাজেই আপনি সিদ্ধান্ত দেবেন না; প্রতিদিনের কিছু ছোটোখাটো কাজে তাকে নিজ থেকেই সিদ্ধান্ত নিতে দিন। যেমন; সে কোন পোশাকটি পরতে চায় বা কী খেতে চায়, এরকম সিদ্ধান্ত নিতে শিশুকে উৎসাহিত করুন।

০৬. বিভিন্ন বিষয়ে শিশুকে প্রশ্ন করুন

আপনার শিশুকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করুন ও তাকে নিজ থেকেই উত্তর দিতে সাহায্য করুন। যেমন; কেন সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নামা ঠিক নয়। এতে সে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেতে পারে বিষয়টা তাকে বুঝিয়ে বলুন।

০৭. শিশুকে খেলতে দিন

শিশুকে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলাতে উৎসাহ দিন। এটা হতে পারে ছোট ছোট কুইজ, সুডোকু, লুকোচুরি, লুডু বা একটু বড় হলে দাবা, ক্রিকেট, ফুটবল বা তার যেসব খেলায় আগ্রহ রয়েছে। এতে তার অন্য শিশুদের সঙ্গে যোগাযোগের দক্ষতা বাড়বে এবং বুদ্ধি বিকাশে সাহায্য করবে।

শিশুর বুদ্ধি বিকাশে খেলার ব্যবস্থা

ছোট্ট সোনামণির মেধার সুষ্ঠু বিকাশের প্রথম ধাপ পরিবার থেকেই শুরু হয়। শিশুর বুদ্ধি বিকাশে খেলা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। শুধুমাত্র বইখাতা নিয়ে বসলেই সন্তান বুদ্ধিমান হয়ে যায়না আর সব শিশু বইখাতা নিয়ে বসেও থাকতে পছন্দ করে না। তাই শিশুর মেধার ভিত মজবুত করতে হলে তাকে খেলাধুলা ও হাসি আনন্দের মধ্য দিয়ে একটু একটু করে বুদ্ধিমান ও মেধাবী করে তুলতে হবে।

কোন কোন খেলার মাধ্যমে আপনি তার মেধার বিকাশ সাধন করতে পারবেন সেটা নিয়ে আগে আপনাকে একটা পরিষ্কার ধারণা অর্জন করতে হবে। শিশুকে অতি বুদ্ধিমান করে গড়ে তুলতে গিয়ে তার মাথায় অবশ্যই পাহাড় সমান বোঝা চাপিয়ে দেবেন না। তার ধারণ ক্ষমতা বিবেচনা করে তাকে বিভিন্ন 'ব্রেইন বুস্টিং' বা বুদ্ধি বিকাশজনিত খেলার সাথে পরিচিত করান। এখানে শিশুর মেধা বিকাশে সাহায্য করবে এমন কিছু খেলার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো:

১। দাবাঃ

শিশুর বুদ্ধিমত্তার বৃদ্ধি সাধনের প্রথম ধাপ হিসেবে দাবাকে ধরা যেতে পারে। ভেনিজুয়েলার ৪০০০ শিক্ষার্থীর উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে দাবা খেলে এমন ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই ৪ মাসের মধ্যে 'আইকিউ' বা বুদ্ধিমত্তার স্কোর উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। আপনার সোনামণিকে মেধাবী করে তুলতে চাইলে তাকে খেলার ছলে দাবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে, দাবা যেহেতু ছোট ও বড় উভয়ের খেলা, সেহেতু ভুলেও শিশুর মাথায় চাপ সৃষ্টি করবেন না। সে যাতে পুরো খেলাটা উপভোগ করতে পারে সেটা সবার আগে নিশ্চিত করতে হবে। একবার শিশুটি মজা পেয়ে গেলে মেধার বিকাশ এবং খেলাধুলা দুইটাই হবে।

২। সুডোকুঃ

আমেরিকান একদল বিজ্ঞানী সুডোকু খেলাকে 'ব্রেইনগেম' বা মস্তিষ্কের খেলা বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুডোকু শিশুর মেধা বিকাশে ও মস্তিষ্ক বিকাশে ব্যাপক সাহায্য করে। এটা এমন একটি মজার খেলা যেটা আপনার সন্তানের মধ্যে ইউনিটি বা দলগত শক্তি সম্পর্কে জ্ঞান দেয় এবং একই সাথে আপনার বাচ্চাকে মনোযোগী ও ঠান্ডা মেজাজি হতে উৎসাহী করে তোলে।

৩। লুডুঃ

লুডু খেলার সাথে আমরা সবাই পরিচিত। এই লুডু খেলাও কিন্তু শিশুদের মেধা ও বুদ্ধি বিকাশে আরও একটি অন্যতম সহযোগী খেলা। সময় পেলে বড়রা শিশুদের সাথে নিয়ে লুডু খেলতে বসতে পারেন। আপনার শিশুকে সাপ লুডু খেলার সাথে আগে পরিচয় করিয়ে দিন। তাকে একটু একটু করে খেলার নিয়ম-কানুনগুলো বুঝিয়ে দিন। মজার এই খেলাটি আপনার সন্তানকে অংক ভীতি থেকে বের করে আনবে।

৪। পাজল গেম বা ধাঁধার খেলাঃ

শিশুকে মেধাবি করে তোলে এমন আরও একটি খেলা হলো পাজল গেম। ভীষণ মজার এই খেলাটি আপনার শিশুকে মনোযোগী করে তুলবে। শুধু আপনাকে একটু কষ্ট করে শিশুকে খেলার মজার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

৫। 'ট্রেজার হান্ট' বা গুপ্তধন খোঁজাঃ

আমাদের কাছে গুপ্তধন মানেই সোনা-দানা আরও কতকিছু কিন্তু আপনার শিশুর কাছে সামান্য একটা 'টেডি বিয়ার', একটা চকলেট অথবা একটা খেলনা বল বিশাল রকমের গুপ্তধন। আপনার শিশুর বুদ্ধি বিকাশে এই সামান্য খেলনাগুলো কাজে লাগাতে পারেন। একটা 'টেডি বিয়ার', চকলেট বা খেলার বল নিয়ে কোথাও লুকিয়ে রেখে শিশুকে খুঁজতে দিন। পরে যখন সে জিনিসটা খুঁজে পাবে তখন তাকে কমপ্লিমেন্ট দিতে ভুলবেন না। এই খেলাটা শিশুর একাগ্রতা ও মনোযোগ বাড়াবে আর তার কৌতুহল ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেবে।

৬। গুনতে শেখানোঃ

পিতা-মাতা বা বড়রা পাশে বসিয়ে আহামরি ধরনের কোন খেলনা বা সময় অপচয় না করে যে খেলার মাধ্যমে শিশুর মেধা বাড়িয়ে তুলতে পারে সেটা শিশুকে শেখানো, যেমন: গুনতে শিখানো। এখন নিশ্চয় আপনার মাথায় প্রশ্ন এসেছে, পাশে বসিয়ে কোন খেলনা বা কাগজ কলম ছাড়া গুনতে শেখা খেলা আবার কেমন? খুব সহজ, একটি প্লেটে কয়েকটি মটর দানা, ছোলা বুট বা চকলেট দিয়ে শিশুকে পাশে বসিয়ে তাকে গুনতে শেখান। মাঝে মধ্যে কয়েকটি মটর দানা শিশুর মুখে পুরে দিন। দেখবেন আপনার ছোট্ট মুখটাই হাসি ফুটিয়ে পাশে বসে খেলবে আর খেলার ছলে গুনতেও শিখবে।

৭। রঙ তুলি নিয়ে খেলাঃ

বাচ্চার বুদ্ধির বিকাশ সাধনে অল্পকিছু রংতুলি অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। আপনার ছোট্ট সোনামণির সুপ্ত মেধা বিকাশ তো বটেই আঁকিবুঁকির মাধ্যমে সে মানসিকভাবেও অনেক অগ্রগতি অর্জন করবে। তাই বাচ্চার খেলার তালিকায় রংতুলি রাখতে ভুলবেন না।

ধাপ - ৫: শিশুর মেধা বিকাশে করণীয়: মা-বাবা/অভিভাবকদের জন্য

শিশুর মেধা বিকাশে করণীয় কি সে সম্পর্কে কোন ধারণা আছে কি না তা উপস্থাপক অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করবেন। তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে লিপিবদ্ধ করবেন। এরপর সহায়ক তথ্য ও স্লাইড প্রদর্শন করে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

শিশুর বুদ্ধির বিকাশে যা করণীয়

১. গর্ভবতী মায়ের যত্ন নেয়া

যেহেতু শিশুর বুদ্ধির বিকাশের ৭০ ভাগ মায়ের গর্ভকালীন অবস্থায় হয়, তাই গর্ভকালীন মাকে ফলিক এসিড, আয়রন, জিংক, ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো; পর্যাপ্ত বিশ্রাম, মানসিক চাপমুক্ত এবং হাসিখুশি রাখতে হবে।

২. শিশুর এক থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বিশেষ যত্ন নেয়া

শতকোটিরও বেশি নিউরন নিয়ে একটি মানবশিশুর জন্ম হয়। শিশুর বুদ্ধির বিকাশ যেহেতু মস্তিষ্কের নিউরনের ওপর নির্ভরশীল এবং এই নিউরনের বৃদ্ধি শুধু গর্ভকালীন ও জন্মের প্রথম পাঁচ বছরেই সম্পন্ন হয়, তাই এ সময়গুলোতে শিশুর চাই বিশেষ যত্ন।

৩. শিশুকে পুষ্টিকর খাবার খেতে দেয়া

প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবারের মাধ্যমে শিশুর মেধার বিকাশ ঘটাতে হবে। মেধা নষ্ট করে এমন ক্ষতিকর খাবার বাদ দিয়ে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড, বেশি করে প্রোটিন, জিংক, ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট জাতীয় খাবার খাওয়াতে হবে।

৪. মেধার বিকাশে শিশুর চাই পর্যাপ্ত ঘুম

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, অপর্যাপ্ত ঘুম শিশুর বুদ্ধির বিকাশে বিঘ্ন ঘটায়, তাই শিশুর মেধার বিকাশে পর্যাপ্ত ঘুমের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

এ ছাড়া-

- ভালো কাজে শিশুকে সব সময় উৎসাহিত করা এবং প্রশংসা করা
- শিশুর সামনে পারিবারিক ঝগড়া, অশোভন আচরণ না করা
- পরিবারের ও প্রতিবেশীর শিশুর সঙ্গে নিজের শিশুকে মিশতে দেয়া এবং খেলার সুযোগ দেয়া
- শিশুর সামনে সিগারেটসহ অন্যান্য নেশা না করা
- শিশুকে বিভিন্ন জিনিস, মানুষের সঙ্গে পরিচয় করে দেয়া। এতে মেধার বিকাশ ঘটে
- শিশুর ওপর সব সময় কোনো কিছু চাপিয়ে না দেয়া। তাকে পছন্দ ও দায়িত্ব নেওয়ার সুযোগ দেয়া। এতে শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়বে
- শিশুকে বকা, ধমক, উচ্চ স্বরে কথা ও প্রহার না করা। এতে মেধার বিকাশে বিঘ্ন হয়
- শিশুকে প্রচুর সময় দেয়া। তার সঙ্গে কথা বলা। শিশুর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা। অবসরে শিশুকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, এতে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে
- সৃষ্টিশীল বিভিন্ন কাজে শিশুকে উৎসাহিত করা। এতে মেধার বিকাশ ঘটে।

ধাপ - ৬: সারসংক্ষেপ

মনে রাখতে হবে, প্রাকৃতিকভাবেই একটি শিশু বেড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে তার মেধা ও মনন। শিশুর এই মানসিক বিকাশ অনেকখানিই নির্ভর করে তার পরিচর্যার উপর। শিশুর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশে মা-বাবা/অভিভাবকদের এবং বড়দের যেসব দায়িত্ব ও করণীয় আছে সেগুলো পালন করতে পারলে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোবৃত্তিয় বিকাশ যথাযথ হবে এবং শিশু পরিবার ও জাতির জন্য একজন গঠনমূলক ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন:

১) সাধারনত কিভাবে শিশুর বিকাশ ঘটে? কিভাবে বোঝা যাবে যে শিশুর বিকাশ হচ্ছে?
২) শিশু বিকাশের বয়স ভিত্তিক বিভিন্ন স্তর আলোচনা কর। কি কারণে শিশুর স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়?
৩) শিশুর মেধা বিকাশে বাবা-মা/অভিভাবকদের কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত?
৪) শিশুর মেধা বিকাশে কি ধরণের খেলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে?

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা প্যাকেজ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা
www.hsd.gov.bd

স্মারক নম্বর : ৪৫.০০.০০০০.১৭১.০৬.০১২.২০.১২৮

তারিখ : ০৯ মার্চ ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ / ২৫ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

প্রজ্ঞাপন

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে কার্যকর এসবিসিসি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত 'Comprehensive Social and Behaviour Change Communication (SBCC) Strategy 2016' এর আলোকে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (এইচপিএনএসপি)- এর অধীনে বাস্তবায়িত অপারেশন প্ল্যানসমূহের অন্তর্ভুক্ত এসবিসিসি কার্যক্রমের সমন্বয় জোরদার করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের মাধ্যমে চলমান বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচির উন্নয়নপূর্বক 'বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা প্যাকেজ' প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো।

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা প্যাকেজ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটি

অতিরিক্ত সচিব (জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	সভাপতি
উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সদস্য সচিব
প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (উপসচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
প্রতিনিধি, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ (উপসচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
প্রতিনিধি, তথ্য মন্ত্রণালয় (উপসচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপসচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
প্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (উপসচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
প্রতিনিধি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (উপসচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, আইইসি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	সদস্য
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এমসিআরএএইচ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	সদস্য
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এলঅ্যান্ডএইচইপি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এনএনএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এমএনসিঅ্যান্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এনসিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সিবিএইচসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
ইউএসএআইডি উজ্জীবন এসবিসিসি প্রজেক্ট (কারিগরি সহায়তার জন্য)	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধি :

১) এসবিসিসি সংশ্লিষ্ট ওপি সমন্বয় কর্মশালার সুপারিশের আলোকে গৃহীত আন্তঃওপি এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি বিষয়ক পর্যালোচনা, সমন্বয় ও অনুমোদন;
২) আন্তঃওপি এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচির সমন্বয় সাধন করে বাস্তবায়নের পদ্ধতি নির্ধারণ;
৩) আন্তঃওপি এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বিত বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও সময়ে সময়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান;
৪) আন্তঃওপি এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচির অগ্রগতি এবং ফলাফল পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন; এবং
৫) কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী সভায় মিলিত হবেন এবং ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমন্বয়ে সভার কোরাম গঠিত হবে। কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

০৯/০৩/২০২০
ড. গোলাম মোঃ ফারুক
উপসচিব
ফোন : ৯৫১৫৫৩১
ph2@hsd.gov.bd

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা প্যাকেজ প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অপারেশনাল প্ল্যান (ওপি) ও ইউনিটসমূহ

১. আইইএম ইউনিট ও আইইসি ওপি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো ও এলএন্ডএইচইপি ওপি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩. জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান ও এনএনএস ওপি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৪. সিবিএইচসি ওপি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫. এনসিডিসি ওপি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬. এমএনসিএন্ডএএইচ ওপি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৭. সিডিসি ওপি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৮. এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিট ও এমসিআরএএইচ ওপি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯. সিসিএসডিপি ওপি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. এফপি-এফএসডি ওপি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. টিবি-এল এন্ডএএসপি ওপি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

SCAN ME

এই পুস্তিকাটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছে। ইউএসএআইডি উজ্জীবন এসবিসিসি প্রকল্প পুস্তিকাটি প্রণয়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে এবং আমেরিকার জনগণের পক্ষে ইউএসএআইডি এতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। এখানে প্রকাশিত মতামতের সাথে ইউএসএআইডি বা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে।

উজ্জীবন প্রকল্পটি যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে জনস্ হপকিন্স সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস্, বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস্ (বিসিসিপি) এবং সেভ দ্য চিলড্রেন।